© 2019 IJRTI | Volume 4, Issue 2 February 2019 | ISSN: 2456-3315

শ্রী গীতগোবিন্দম্, বুদ্ধ ও ভক্তিবাদ।

Dr. Sk Asraf Ali
Assistant Professor
Department of Sanskrit
The Sanskrit College and University (Erstwhile Sanskrit College), Bankim Chatterjee Street, Kolkata – 700073
Email id: asrafali13@gmail.com

বৈদিক যুগের শেষের দিকে যখন উপনিষদের সময় শুরু হল তখন কর্মমার্গের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ধীরে ধীরে শীথিল হল। তার অন্যতম কারণ হল যজ্ঞে পশুহত্যা। বহু মানুষের চিত্ত এতে ব্যথিত হল । তাঁরা ধীরে ধীরে জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমাগের দিকে অগ্রসর হল কিন্তু তা বলে কর্ম ছাড়েন নি, কর্মের অর্থ পরিবর্তিত হল । আগে তাঁদের কর্ম ছিল বৈদিক যাগ-যজ্ঞদির বাহ্য কর্ম, এখন তাঁরা অর্থ করলেন ধ্যান-ভক্তির মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক কর্ম। পরবর্তীকালে জ্ঞান-কর্ম-ও ভক্তি _ এই 'ত্রি' সমন্বয় উপনিষদ্ , শ্রীমদ্ভাগবদ্ভগীতা, শ্রীমদ্ভাগবত ও বৌদ্ধধর্ম মধ্যে ধ্বনিত হল । ভক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে- ভক্তি- (ভজ্ - ভাবে+ ক্তি। এর অর্থ সেবা করা, পূজা করা,পূজ্যের প্রতি অনুরাগ।) শাস্ত্রে বলা হয়েছে-

" অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যাং সেবনং স্মরণং তথা।
কীর্ত্তনং শ্রবণং সখ্যং তথৈব আত্মনিবেদনম্ ।।"

উপনিষদের ঋষিগণ ছিলেন বিশ্বের মুক্তব অঙ্গনের অধিবাসী। কোন ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ প্রাণী তাঁরা ছিলেন না, সমগ্র বিশ্ববাসীকে তাঁরা উদার কণ্ঠে আহ্বান করেছিলেন –

"শৃণ্বন্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যনি তস্থুঃ---
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্।"- শ্বেতশ্বতরোপনিষদ্ ২/৫

এই মন্ত্রের প্রবক্তা ও শ্রোতা যাঁরা তাঁরা বিশ্বাত্মা। তাঁরা যথার্থই অমৃতের সন্তান। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন মানুষ মাত্রেই অমৃতের সন্তান সুতরাং অমৃতময়। মানুষ যদি অমৃতের পুত্র, তবে বিশ্বের সমস্ত মানুষ পরস্পর ভ্রাতা। তাহলে মানুষ কেন মানুষকে হিংসা করে? কেন দুর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার, শাসন- শোষণ ? ঋষি বললেন- লোভের জন্য। মানুষ লোভ রিপুর দ্বারা উত্তেজিত হয়েই অন্যের শান্তিতে বিঘ্ন ঘটায়। বলেছিলেন- "ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্ ।।"- ঈশোপনিষদ্-১

তাঁরা চেয়েছিলেন মানুষের মনকে লোভ ,ঈর্ষা ও হিংসামুক্ত করে মঙ্গল ও কল্যাণের পথে উদার ঐক্য ও মানবিকতার পথে পরিচালিত করতে। এই জন্য তাঁদের কণ্ঠে প্রার্থনা শোনা যায়- "হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ।।" - ঈশোপনিষদ্-১৫

উপনিষদের এই উদার মানসিকতার উত্তরাধিকার বৌদ্ধধর্মও রক্ষা করে আসছে।
বুদ্ধের লক্ষ্য হল অষ্টাঙ্গিক মার্গের মাধ্যমে নির্বাণ অর্জন করা , যার মধ্যে রয়েছে তৃষ্ণা নিবারণ এবং মানসিক নিয়ন্ত্রণ। বৌদ্ধ দর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে- 'ব্রহ্মবিহার'—মৈত্রী,করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনা

বৌদ্ধধর্ম এবং দর্শনের ভিত্তি হল বোধি বা পরম জ্ঞান। একেই বোধিসত্ত্ব বলা হয়। বুদ্ধত্ব অর্জনের আগে, বোধিসত্ত্বও একজন বুদ্ধ ছিলেন। বৌদ্ধত্ব অর্জনের পর তিনি বুদ্ধ হয়েছিলেন। বোধিসত্ত্ব বুদ্ধত্ব অর্জন করেন। জগতের মঙ্গলের জন্য। তিনি প্রার্থনা করেন, "আমি যেন জগতের মঙ্গলের জন্য বুদ্ধ হই- "ভবেয় বুদ্ধো জগতো হিতায়" । তিনি আরও বললেন- সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু- বিশ্বের

সকল প্রাণী সুখী হউক – বিশ্বমৈত্রীর এই গঙ্গোত্তরী ধারায় শাক্যসিংহের মানবিক আহ্বান প্রবাহিত হয়েছিল। মানবধর্মের এই মানবিক লক্ষণ বৌদ্ধধর্মের পরম অভিব্যক্তি ধম্মপদে-

"সুখকামনি ভূতানি যো দণ্ডেন বিহিংসতি।
অত্তনো সুখমেসানো পেচ্চ সো ন লভতে সুখং।।
সখকামানি ভূতানি যো দণ্ড হিংসতি।
অত্তনো সুখমেসানো পেচ্চ সো ন লভতে সুখং ।।"- ধম্মপদ-১৩১-৩২

বৌদ্ধধর্মের ভক্তিপূর্ণ উপদেশ-

"মা বোচ ফরুসং কঞ্চি, বুত্তা পটিবদেয্যু তং।
দুক্খা হি সারম্ভকথা, পটিদণ্ডা ফুসেয্যু তং।।"-- ধম্মপদ-১৩৩

অর্থাৎ কোন ব্যক্তিকে কর্কশ বাক্য বলো না। যদি বলো সেও তোমাকে বলবে । ক্রোধযুক্ত বাক্য দুঃখদায়ক দণ্ডের প্রতি দণ্ড তোমাকেই স্পর্শ করবে।
বোদ্ধধর্ম-দর্শনে এই মৈত্রী ও প্রেমের, ত্যাগ ও করুনার স্বরূপ কি? যে উদারতা ও সাম্য বৌদ্ধসংঘকে কল্যাণশ্রী দান করেছিল –

"দিট্‌ঠা বা যে চ অদিট্‌ঠা
যে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে
ভূতা বা সম্ভবেসী বা
সব্বে স্ততা ভবন্ত সুখিতত্তা।"-সুত্তনিপাত, মেত্তসুত

দৃষ্ট বা অদৃষ্ট দূরবাসী বা নিকটবাসী, ভূতকালের বা ভবিষ্যতের সকল প্রাণী সুখী হউক। বৌদ্ধ সাধনায় জীব মাত্রেই তুল্য, কোন জীবই ঘৃণার নহে । সুতরাং সকলের প্রতি সমান মৈত্রী প্রসারিত করে দিতে হবে।
জয়দেবের আগমনের আগেও, বঙ্গ দেশে সহজযানের উপাদান খুবই জনপ্রিয় ছিল । এই সহজ সম্প্রদায়ের একটি শাখা শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রভাবে গৌড়ীয় ধর্ম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তারা তাদের সাধনা পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেনি । মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সহযানের উৎপত্তি সম্পর্কে বলেছেন : "বুদ্ধের মৃত্যুর কিছুক্ষণ পরেই , তাঁর শিষ্যরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন ; একটি দল বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে অবশেষে সহাজান সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। প্রায় দুই হাজার বছর আগে বৌদ্ধদের মধ্যে যে দুটি দল গঠিত হয়েছিল তাদের নাম ছিল মহাস্থবির এবং মহাসাংঘিক ।

এটা লক্ষ করা যে বৌদ্ধরা ধর্মকে নারীরূপে বিবেচনা করেন। শাক্য যুগের প্রথম শতাব্দীতে নাগার্জুনের নেতৃত্বে মহা সাংঘিক গোষ্ঠীর একাংশ মহাযান সম্প্রদায় গঠিত হয়েছিল । তারা প্রজ্ঞা (ধর্ম) , উপায় (বুদ্ধ) এবং বোধিসত্ত্ব (সংঘ) এর উপাসক। শকাব্দের পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই ত্রিদেবতারা , নিত্যবুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্ব হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। এর পরে বজ্রযান নামে আরেকটি সম্প্রদায় গঠিত হয়। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে, ওড়িশার রাজা ইন্দ্রভূতি তাঁর পুত্র পদ্মসম্ভবম , কন্যা লক্ষ্মীঙ্ক রায় এবং জামাতা শান্তরক্ষিতের সহায়তায় এই সম্প্রদায়টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাদের দেবতা হলেন পদ্ম-বজ্র ও বোধিসত্ত্ব। তাদের একটি শাখা হল সহজযান ।রাঢ় দেশের আচার্য্য নাড় পণ্ডিত,পণ্ডিতপত্নী নিগু বা জ্ঞান ডাকিনী এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত । তাদের দেবতা হলেন শূন্য বজ্র বোধিসত্ত্ব। এই সম্প্রদায়টি খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে গঠিত হয়েছিল। তাদের মতে, একজন পুরুষ এবং একজন মহিলার মিলনের সুখই সর্বোচ্চ এবং চূড়ান্ত সুখ। তারা এই সুখ সম্ভোগের জন্য দেহতত্ত্ব নিয়ে সাধনা করে বহুবিধ উপায় সিদ্ধ হয়েছিল।
শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে, জয়দেব এই সহজিয়াদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। সহজিয়ারা নরনারীর যে মিলন-সুখকে একমাত্র কাম্য বলে গ্রহণ করেছেন জয়দেব শ্রী- রাধাকৃষ্ণের মিলনকে তাঁর সুখের আশ্রয়স্থল হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন এবং নিজেকে তাঁর দর্শক হিসেবে কল্পনা করেছিলেন এবং তা দেখে সন্তুষ্ট ছিলেন। এই মতামতকে একরকম উপেক্ষা করা যায় না। কারণ বৈষ্ণবধর্মের মধুর ভজনে সখীভাবের উপাসনা - এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। পার্থক্য হল যে সখীগণ শুধু একে অপরকে দেখে তৃপ্তি লাভ করে না , বরং ঘনিষ্ঠ দাস হিসেবে তারা দম্পতির মিলনের আনন্দে ভাগাভাগি করে।

সখীগণ কেবল নিষ্ক্রিয় উদাসীন দর্শক নয় , তারা এই মিলনের সহচর এবং সাহায্যকারী। শ্রীগীতগোবিন্দে এই শেষোক্ত ভাবই প্রকাশিত হয়েছে।

হলায়ুধের 'মৎস্যসূক্ত' গ্রন্থটি প্রমাণ করে যে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে বৈষ্ণবধর্ম এবং বৌদ্ধ ভক্তিবাদকে সংস্কার বা একত্রিত করার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। এই গ্রন্থে, বেদের স্তুতির পাশাপাশি, বীরচারের মতামত এবং একজটা , উগ্রতারা এবং ত্রিপুরা প্রভৃতির পূজাক্রম এবং মন্ত্রগুলি গ্রহণ করা হয়েছে। বৌদ্ধ- তন্ত্রানুমোদিত মহাচীনক্রমের তারাসাধন এবং নীলসারস্বতক্রমের সমন্বয়ের ইঙ্গিত করে।

" জয় জয় তারে দেবি নমস্তে। প্রভবতি ভবতি যদিহ সমস্তে।।.
প্রজ্ঞাপারমিতামিচরিতে। প্রণতাজনানাং দুরিতক্ষয়তে।।

ঐতিহাসিকগণের মতে সম্রাট লক্ষ্মণসেন ১০৯১ শকাব্দে সিংহাসনে আরোহন করেন, কবি জয়দেব শকাব্দের একাদশ শতকের শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। পঞ্চরত্নের অন্যতম রত্ন ছিলেন কবি জয়দেব । শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী নবদ্বীপের নৃপ-সভাদ্বারে নিম্নোক্ত শ্লোকটি ক্ষোদিত দেখেছিলেন –

“গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি পঞ্চৈতে লক্ষ্মণস্য চ।।”

এই পাঁচজন রত্ন হলেন উমাপতিধর, গোবর্দ্ধন, শরণ, ধোয়ী এবং জয়দেব ।

মালবরাজ উদয়াদিত্য ও তাঁর পুত্র লক্ষদেবের শিলালেখ থেকে জানা যায়- “ কর্ণাটকগণ চেদীবংশীয় গাঙ্গেয়দেব এবং কর্ণদেবের খুবই কাছের পরিজন ছিলেন ” । সেনরাজাগণও যে কর্ণাটকগণের অনুরক্ত ছিলেন ইতিহাসে তার প্রমাণ পাওয়া যায় “ কর্ণাটলক্ষ্মী-লুণ্ঠনকারীর দণ্ডবিধান করে হেমন্তসেনশ (বংশলতিকা সেন বংশ- বীর সেন >সামন্ত সেন> হেমন্ত সেন> বিজয় সেন ১০৯৬-১১৫৯ খ্রীঃ > বল্লান সেন ১১৫৯ -১১৭৯ খ্রীঃ > লক্ষণ সেন ১১৭৯-১২০৬ খ্রীঃ গৌরবময় গৌড়-বঙ্গ, কেদারনাথ গুপ্ত, সোপান, কলকাতা-২০১৮ পৃ ৫২) ‘একাঙ্গবীর’ –রূপে খ্যাত হয়েছিলেন। কর্ণাটভূমি ভক্তিবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র তার নমূনা মেলে এই শ্লোকে –

“উৎপন্না দ্রাবিড়ে ভক্তির্বৃদ্ধিং কর্ণাটকে গতা।
স্থিতং কিঞ্চিন্মহারাষ্ট্রে গুর্জ্জরে জীর্ণতাং গতা।।”

রামানুজ লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক এবং জয়দেব রাধাকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন। বিল্বমঙ্গলের লীলাভূমি- ‘শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত’, রাধাকৃষ্ণের উপাসক নিম্বার্কও দাক্ষিণাত্যবাসী – তাঁরা জয়দেবের সমসাময়িক।

প্রবাদ অনুসারে শ্রীজগন্নাথদেবের নামে উৎসর্গীকৃতা জয়দেব-পত্নী পদ্মাবতীর পিত্রালয় ছিল দক্ষিণদেশে। নৃত্যগীতে নিপুণা, ভক্তিমতী পদ্মাবতীকে কবি জীবন্নাধিক ভালবাসিতেন , ‘সংস্কৃত ভক্তমালে’ বর্ণিত- “উভৌ তৌ দম্পতি তত্র একপ্রাণৌ বভূবতুঃ।
নৃত্যন্তৌ চাপি গায়ন্তৌ শ্রীকৃষ্ণার্চ্চানতৎপরৌ।।”

উড়িষ্যার সঙ্গে কবির নিবিড় সম্পর্ক হয়ার ফলে দুই প্রতিবেশী রাজ্যের মধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতির ও ধর্মের সেতু বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। পুরীর জগন্নাথদেবের ভারতবিখ্যাত মন্দির এই সময় নির্মিত হয় ১০৯৬ শকাব্দে, নির্মাণ করেন মহারাজ অনঙ্গভীমদেব। এর ফলে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ভক্তমন্ডলী পুরী সহ দক্ষিণভারতে এক নূতন যুগের অভ্যুদয় ঘটে।এর ফলে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ের আদান প্রদান হয়। সেন রাজবংশের সঙ্গ উড়িষ্যার সম্পর্ক খুব মধুর ছিল। পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরে আজও দু-বেলা গীতগোবিন্দম্ পাঠ হয়। কবি জীবন- বনমালী দাস প্রণীত ‘ জয়দেব চতিত্রে ’ বলেছেন –

“ভিক্ষা মেগে খায় সদা হরি নাম জপে।
হাসে কাঁদে নাচে গায় শিবের মণ্ডপে ।।”

কেন্দুবিল্বে সেই কুলেশ্বর শিবমন্দির আজও বর্তমান। তিনি আরও লেখেন –

“অজয়ের তরঙ্গ বহে অতি সুশোভন।
কিনারে পুষ্পের শোভা গন্ধে হরে মন।।”

জয়দেব এই ঘাটেই রাধামাধব বিগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন ।কেন্দুবিল্বে শ্রীরাধামাধব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন । এখন সেই বিগ্রহ শ্রীরাধা-বিনোদ নামে পূজিত হন। চক্রদত্ত প্রণীত 'সংস্কৃত ভক্তমাল', নাভাজীকৃত 'হিন্দী ভক্তমাল' এবং বীরভূমের কবি বনমালী দাসের 'জয়দেব' - চরিত প্রভৃতি গ্রন্থে জয়দেবের জীবনকাহিনী বর্ণিত আছে। 'জয়দেব-চরিত' প্রায় তিনশো বছরের পুরনো , বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন –" তিনশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী ভক্তবৃন্দ, ভক্তচূড়ামণি জয়দেবকে যে ভাবে দেখিতেন উহাতে তাহার পূর্ণ চিত্র আছে । সে চিত্র ইতিহাস না হইলেও মনোহর, জীবঞ্চরিত না হইলেও উপদেশ-পূর্ণ, ধর্ম্মগ্রন্থ না হইলেও ভক্তিভাবে ভোর ।"
কবির পরিচয় তাঁর কাব্যে যে রসে কবির কাব্য-প্রাণ পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে , যে ভাবে কবির হৃদয় উদ্বেলিত হয় ভাষায় ও ছন্দে তার সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি অসম্ভব হলেও কাব্য সেই রস-ভাবের দ্যোতনা মাত্র । মানুষের অন্তরে যে রস- স্বরূপ অধিষ্ঠিত রয়েছে , কাব্য সেই অন্তর দেবতার স্বতস্ফূর্ত লীলাবিলাস। সুতরাং কবিকে সত্য করে জানার পক্ষে তার কাব্য পরিচয়-ই যথেষ্ট। জনসাধারণের কৌতূহলের সীমা নাই, তাঁর কাব্য আলোচনা করেই পরিতৃপ্ত হতে চান না। তাঁরা চান অন্ত্রে বাইরে সমগ্র মানুষ্টিকে জানতে। অন্তর দেবতা যাঁর কাব্যে ধরা দিয়েছে, সাংসারিক জীবনে, ব্যক্তিগত চরিত্র মানুষ হিসাবে কেমন ছিলেন, না জানতে পারলে স্বস্তি পান না । উপযুক্ত উপকরণ না পাওয়া গেলেও তাতে তাদের ক্ষতি নাই, নিজের বিশ্বাসের অনুরূপ একটা মনগড়া ছবি কল্পনা করেই পরিতৃপ্তি লাভ করেন। আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের মিলন , সংসারে খুবই কম দেখতে পাওয়া যায়। এই জন্যই আদর্শ যাঁর বাস্তব জীবনে মূর্ত্ত হয়ে ওঠে, আমরা তাঁকে 'মহাপুরুষ' বলি । কবিদের এ সম্বন্ধে বিশেষ সুনাম আছে বলে মনে হয় না। কাব্য ও জীবন মিলতে গেলে প্রায়শই হতাশ হতে হয়। কিন্তু জীবনের সমগ্রতা কাব্যে সপরিস্ফুট হয়েছে, আবার কাব্যখানি জীবনে মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করেছে এ হেন কবি জীবন সংসারে সুলভ না হলেও আমাদের বাংলায় তা দুর্লভ নয়। তাই ভারতের অনতিবৃহৎ সম্প্রদায় কবির 'গীতগোবিন্দম্' কাব্যকে যেমন প্রেমধর্মের সূত্র করে থাকেন তেমনি কবি, জীবনকেও সেই সূত্রেরই এক মধুরোজ্জ্বল ভাষ্যরূপে পূজা করে থাকেন।
ভগবদ্- উপাসনার দুটি দিক আছে-একটি ঐশ্বর্য্যের অপরটি মাধুর্য্যের। কবির কাব্য আলোচনায় দেখা যায় – কবি প্রথম জীবনে ঐশ্বর্য্যের – বিধিমার্গের উপাসক ছিলেন, সেই ভাব থেকে সাধনার ক্রমবিকাশে রাগের পথে তিনি মাধুর্য্যের ব্রজকুঞ্জে প্রবেশ করেছেন। শ্রীগীতগোবিন্দে ঐশ্বর্য্য দিয়ে আরম্ভ করে, রসের ক্রমপরিপুষ্টিতে কিরূপে মাধুর্য্যের উৎকর্ষ বর্ণিত হয়েছে এবং সে রসপরিপুষ্টি, কবি হৃদয়ের অনুভূতি প্রত্যক্ষ পরম সত্যের কবিত্ব প্রকাশ ও বিকাশ রসজ্ঞ পাঠক মাত্রেই তা অবগত আছেন। শ্রীগীতগোবিন্দের শুরুতে দশবতার স্ত্রোত্রে এবং শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল সঙ্গীতটিতে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যস্বরূপই প্রকাশিত হয়েছে। দশাবতার স্ত্রোত্রে শ্রীকৃষ্ণ সর্বাবতারের কেন্দ্ররূপে বর্ণিত হয়েছেন। টীকাকার পূজারী গোস্বামী বলেছেন- এই দশটি অবতার দশটি রসের অধিষ্ঠাতা, আর সর্ব অবতারের অবতরী শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই সকল রসের আদি অথবা আদিরসের আকর। বৈষ্ণব আলংকারিকগণের মতে মধুররস বা আদিরস সকল রসের শ্রেষ্ঠ , শ্রীকৃষ্ণই আদিরসের মূর্তিমান বিগ্রহ। টীকাকার পূজারী গোস্বামীর মতে- "মৎস অবতার বীভৎসরসের , কূর্ম অদ্ভুতরসের , বরাহ ভয়ানক রসের, নৃসিংহ বৎসলরসের , বামন সখ্যরসের, পরশুরাম রৌদ্ররসের , শ্রীরাম করুণরসের,বলরাম হাস্যরসের , বুদ্ধ শান্তরসের। কল্কি বীররসের অধিষ্ঠারূপে বর্ণিত হয়েছে। " শ্রীবদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে 'মল্লানামশনি' শ্লোকে এই দশটি রসের অধিষ্ঠাতৃত্বরূপে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণকেই বলা হয়েছে। মাধুর্য্যের রূপের ক্ষেত্রে দেখি- কবি " দেহি পদপল্লবমুদারম্ " লিখতে কুণ্ঠিত হয়েছেন। শ্রীমতী রাধার পাদপদ্ম তিনি কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে অর্পণ করাবেন এই সঙ্কোচে তাঁর হৃদয় দ্বিধাদ্বন্দ্বে আন্দোলিত হয়েছিল। শ্রীভগবানের ঐশ্বয্যের রূপ তিনি কখনো ভুলতে পারেন নি। পারলে তাঁর মনে কখনও ঐরূপ সন্দেহের অবকাশ আসত না। সংশয় জাগল – কারণ জীবন ও কাব্য তাঁর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সাধনার পথে তিনি যেমন কুঞ্জের পর কুঞ্জ অতিক্রম করেছেন , সাধনালব্ধ সত্যগুলিও তেমনই তাঁর কাব্যে অভিব্যক্তি হয়েছিল। অবশেষে গভীরতর

আর্ত্তিতে আকৃষ্ট হয়ে সাধনার ধন একদিন স্বয়ং এসে মনের সকল সন্দেহ ভেঙ্গে দিল।
" ঘট ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনম্।
যেন বা ভবতি সুখজাতম্ ।।
ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনম্
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম ।।" (৪ , ৫। ১০ গীতগোবিন্দম্)

কবি আপন দাম্পত্য প্রেমের প্রেমের মধ্য দিয়ে মানব প্রেমের শ্রেষ্ঠ , সার্থক ও সুন্দরতম পরিণতিরূপেই ভগবৎপ্রেম লাভ করেছিলেন। আবার পদ্মাবতীর পতিপ্রেম এমনি প্রগাঢ়, এতই পবিত্র, এমনি নিষ্ঠাপূর্ণ যে ভগবান তাঁকে জয়দেবকেপতিরূপেই দর্শন দিয়ে তাঁর নারীত্বের সাধনাকেই সার্থক করে ছিলেন । কবি জীবনের এই সাধনার ইতিহাস কবি্র দেশবাসী জানতেন বলেই কবি তাঁদের কাছে জগন্নাথের অংশরূপে পূজাপ্রাপ্ত হন। গীতগোবিন্দ আলোচনায় দেখা যায় পরকীয়াতত্ত্বের কোন সমর্থন নাই। যা অনেক পদাবলীর কবিগণ সমর্থন করেছেন। চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি আপন_ভোলা প্রণয়ি- দম্পতির দাম্পত্যের মধুময় আদর্শ চিত্র। এই চিত্র সমাজকে হৃদয়বন্ধনের সঙ্গে সামাজিক বন্ধনের আদর্শ পথ দেখায়। মনষ্যু হৃদয়ে সামাজিক প্রেম ও ঐশ্বরিক ভক্তি-প্রেম সহাবস্থান যুগে যুগে পূজার বিগ্রহ হয়ে থাকে। ভগবানের ঐশ্বর্য্যরূপ কখনো কখনো ভক্তকবি তুলসীদাসে রামচরিতে ধরা পড়েছে, তিনি ঐ রূপে বিস্মৃত হয়েছেন। ভগবান্ ভক্তকে এমনই ভালোবেসেছেন, যে নিজের প্রভুত্ব ভুলে ভক্তের দাস হয়ে পড়েছেন। বলেছেন-

"ঐসী হরি করত দাস পর প্রীতি।
নিজ প্রভূতা বিসারি জন কে বস হোত সদা য়হ রীতি।।
অরথ ন ধরম ন কামরুচি ,গতি ন চহৌঁ নিরবান ।
জনম জনম রঘুপতি ভগতি য়হ বরদান ন জ্ঞান ।।"

চৈতন্যদেবের সেই প্রার্থনার সঙ্গে এর সাদৃশ্য দেখা যায়-
"ন ধনং ন জনং সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতকী সদা ত্বয়ি।।"

এমন মানবিক প্রেমভক্তির প্রকাশ পৃথিবীর অন্য কোন দেশে সত্য-ই দুর্লভ
ভক্তিবাদের অন্যতম বিষয় অহিংসা বা সকল জীবে প্রেম। ভারতের এই ভক্তিতত্ত্ব আস্তিক নাস্তিক সকল ধর্ম-দর্শনের মধ্যেই প্রবাহ বা ধারা বইছিল। হিংসাকে তাঁরা বারবার বর্জনের কথা বলেছেন। বেদে-বলাহয়েছে-

"ওঁ পিতা নোসি পিতা নো বোধি নমস্তেহস্তু মা মা হিংসীঃ।" (৩৭। ২০ শুক্লযজুর্বেদ)
"বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব। যদ্ভদ্রং তন্ন। আসুব " (৩০। ৩ শুক্লযজুর্বেদ)
"নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।।" (১৬ । ৪১ শুক্লযজুর্বেদ)

বিষ্ণু পুরাণে হিংসা নিবারণের জন্য অসুরগণকে মায়ামোহের উপদেশদান, বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তিতে বলা হয়েছে- যদি তোমরা মুক্তির ইছা কর তা হলে আমার বাক্যানুসারে কর্ম কর এবং মুক্তির অসংবৃত দ্বার-স্বরূপ মদুক্ত ধর্মের অনুষ্ঠান কর। এই ধর্মই মুক্তির উপযোগী, এর থেকে শ্রেষ্ঠ অন্য কোন ধর্ম নাই। এই ধর্মে অবস্থান করলে স্বর্গ বা মুক্তি, যা অভিরুচি তা হতে পারে। তোমরা সকলেই মহাবল, তোমরা এই ধর্ম গ্রহন কর, এইভাবে মায়ামোহ নানা যুক্তি দ্বারা দৈত্যগণকে বেদমার্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন।
"কুরুধ্বং মম বাক্যানি যদি মুক্তিমভীপ্সথ।
অর্হধ্বং ধর্ম্মমেতঞ্চ মুক্তিদ্বারমসাবৃতম্ ।।" (৫। ৩। ১৮ বিষ্ণুপুরণম্)

© 2019 IJRTI | Volume 4, Issue 2 February 2019 | ISSN: 2456-3315

"এবং প্রকারৈর্বহুভির্যুক্তিদর্শনবর্দ্ধিতৈঃ।
মায়ামোহেন দৈত্যাস্তে বেদমার্গাদপাকৃতাঃ।।" (বিষ্ণুপুরণম্ ৭। ৩ ১৮)

যদি নির্বাণমুক্তি বা স্বর্গ তোমাদের কামনা থাকে, তা হলে পশুহিংসা(বধ্ বা বলি) প্রভৃতি দুষ্ট ধর্মে কোন ফল হবে না- এটা জানা দকার, জগৎ বিজ্ঞানময় বলে অবগত হও। তাদের মধ্যে অনেকে বেদের নিন্দা করল। কেউ কেউ দেবগণের নিন্দা করল, আবার অনেকে যজ্ঞ- কর্মকাণ্ড ও ব্রাহ্মণের নিন্দা করলেন । যে কার্য্যে কোন প্রাণীর হিংসা হয়, এইরূপ কাজ কখনই ধর্ম হয় না – এই বাক্য কখনই যুক্তিসঙ্গত নয়। ঘৃত সমুহ অনলে দগ্ধ হলে ফল দান করে—তা বালকের যোগ্য বাক্য

"স্বর্গার্থং যদি বাঞ্ছা বো নির্বাণার্থমথাসুরাঃ।
তদলং পশুঘাতাদিদুষ্টধর্ম্মৈর্নিবোধত।। (১৫। ৩।১৮ বিষ্ণুপুরাণম্)
কেচিদ্বিনিন্দাং বেদানাং দেবানামপরে দ্বিজ।
যজ্ঞকর্ম্মকলাপস্য চ দ্বিজন্মনাম্ ।। (২৩.৩.১৮)
নৈতদ্যুক্তিসহং বাক্যং হিংসা ধর্ম্মায় নেষ্যতে।
হবীংষ্যনলদগ্ধানি ফলায়েত্য-র্ভকোদিতম্।।" (২৪। ৩। ১৮ বিষ্ণুপুরাণম্) ।

জয়দেবের কালে কৃষ্ণকথা অন্যভাবে স্বাতন্ত্র্য পেয়েছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে পূর্বপ্রচলিত কৃষ্ণকথা নূতনভাবে প্রচার করলেন তিনি। পুরাণকথিত দশাবতারকে একটু পরিবর্তিত করে নিলেন। ভাগবতের বর্ণানা না নিয়ে তিনি লোকপ্রচলিত দশাকৃতিহদারণরূপ গ্রহণ করেছেন এবং কৃষ্ণকে অবতার (অব-তর্ + ষ্ণ, তর্- ধাতুর অর্থ রক্ষা করা , অবশেষে যিনি রক্ষা করেন বা অবতরণ করেন , তিনি অবতার) মেনেছেন । মনে রাখতে হবে, তার আগে বাংলায় পাল আমল চলছিল। বাংলার মানুষ বেশীভাগ বৌদ্ধ ধর্মালম্বী ছিলেন কিন্তু কবিজয়দেব সেন আমলের কবি। সেন রাজাগণ ব্রাহ্মণ (হিন্দু) ছিলেন। বিপরীত দুই ধর্ম-দর্শনের বিরোধে সাধারণ মানুষ অস্থির অসহায় , কবি দুই সম্প্রদায়কে একত্রে সহবস্থানের জন্য অবতারতত্ত্বে বুদ্ধ বন্দনা করলেন, অহিসা, ভক্তি, করুণা, মৈত্রীর মধ্য দিয়ে সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা। ভক্তকবি গায়লেন-

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং।
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্।।
কেশব, ধৃতবুদ্ধশরীর, জয় জগদীশ হরে ।।" (১। ১৩ গীতগোবিন্দম্)

জীবকে যাগ-যজ্ঞ ও পুরোহিততন্ত্রের করালগ্রাস থেকে রক্ষা করলেন। 'গোবিন্দ' নাম কীর্ত্তনেই আনন্দ-মুক্তি। আজ থেকে প্রায় তিন হাজার আগে ভগবান্ বুদ্ধদেবও একইভাবে মানুষকে 'ত্রি-রত্ন শরণ' এর মধ্য দি্যেই মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন-

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি,
ধম্মং শরণং গচ্ছামি,
সংঘং শরণং গচ্ছামি ।"

বর্তমান সময়ে প্রশ্ন জাগে, এই মহাপুরুষদের প্রদর্শিত পথ থেকে আমরা কি পথভ্রষ্ট ? আমাদের পথের দিশা তো মহাভারতকার মহাভাবে-ই দিয়েছেন-

" মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।"

সহায়ক গ্রন্থ সূচি-

১) শব্দসার, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা-২০০৩
২) মহাভারতের চরিতাবলী, শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য্য, আনন্দ পাবলিশার্স , কলকাতা-১৪১৩
৩) কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-১৩৮৪
৪) গৌরবময় গৌড়-বঙ্গ, কেদারনাথ গুপ্ত, সোপান, কলকাতা-২০১৮
৫) দেশ,সুবর্ণজয়ন্তী প্রবন্ধ সংকলন ১৯৩৩-৮৩, সাগরময় ঘোষ, আনন্দ পাঃ, কলকাতা-১৯১৯